ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1704-1710
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.392

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'দীপ জ্বেলে যাই': অভিনয়ের আড়ালে এক নারীর ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের গল্প

রাধা গোবিন্দ নসিপুরী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ashutosh Mukherjee was one of the greatest fiction writers in the 20th-century Bengali Literature. His story '*Deep Jwele Jai*' created a lot of sensation at that time. The narrative of this text revolved around a mental hospital and a nurse. The chief medical officer of this hospital was Colonel Pakrashi. He was a psychiatrist. Three of his patients suffered from mental disorder due to trauma of betrayal in love. He was running an experiment to treat these three patients. The new experiment of Dr. Colonel was to cure the patients by an act of romantic love. Since they had lost their mental stability through betrayal in love, it was only the play-acting of love that could bring them back to their normal state. The nurse Rekha Mitra was assigned the duty of curing them back to normalcy through a romantic play-acting. She has made the new experiment successful by curing the two patients Samaresh Chakraborty and Madhav Some. Next arrived Amar Dutta who had the same history of losing mental balance due to betrayal in love. Rekha Mitra has cured him as well through her love and nursing. From the viewpoint of Dr. Colonel and other nurses she has done a role-playing in this case, but in reality, she cured each of these patients through real love and sacrifice without paying any heed to Colonel's medical instructions. It is as if she lighted the lamp of love and affection within her heart and helped the patients to transcend the world of darkness and reach the world of light. She did not get any reciprocation from any of these persons and hence she turned a mental patient herself in that hospital. This paper attempts to analyze and find how Rekha Mitra's emotions of love and sacrifice transcended her ability of role-playing.
Keywords: Deep Jwele Jai, Mental Hospital, Mental Patients, Nurse, Role-playing, Love, Sacrifice, Cure

খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ১৯২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার বিক্রমপুরের মুখোপাধ্যায় বংশে। পিতা পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা তরুবালা দেবীর পঞ্চম সন্তান ছিলেন তিনি।[১] স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একজন কৃতী লেখক। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' এবং ইংরেজি বই 'ইটারন্যাল সিটি, ও 'ওয়ার ওয়াইন অ্যান্ড উইমেন' এই চারটি বই পড়ে তাঁর লেখক সত্তার জাগরণ হয়েছিল। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'কালচক্র'। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে 'জীবনতৃষ্ণা', 'কাল তুমি আলেয়া', 'নগর পারে রূপ নগর', 'সোনার হরিণ নেই',

পর কপালে রাজারাণী', 'পঞ্চতপা' ইত্যাদি। প্রাণতোষ ঘটকের প্রেরণায় ও উৎসাহে মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় লিখলেন 'নার্স মিত্র' (রচনাকাল **১৯৫১-১৯৫৩**) গল্প। যেটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। 'দীপ জ্বেলে যাই' গল্পটি নেওয়া হয়েছে লেখকের 'রূপসী বাংলার মুখ' (**১৯৯১**) গল্পগ্রন্থ থেকে। গল্পটির পুর্ববর্তী নাম ছিল 'নার্স মিত্র'। পরবর্তীকালে গল্পটির নাম পরিবর্তিত করে 'দীপ জ্বেলে যাই' রাখা হয়।

> "বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরী দু'জন লেখকের রচনা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। একজন শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮), অন্যজন তারাশঙ্কর (১৮৯৮-১৯৩৯)। উভয়ের সাহিত্য যে মানবিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই মানবিক মূল্যবোধে আশুতোষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।"[২]

যে মানবিক মূল্যবোধ তাঁর সাহিত্যের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটি অন্যতম ছোটগল্প 'দীপ জ্বেলে যাই'। আধুনিক সাহিত্যে নারীকে নিয়ে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট এই চরিত্রটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী এক নারী চরিত্র। গল্পে যে নারীর অভিনয়ের আড়ালে ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তার নাম রেখা মিত্র। সে মেন্টাল অবজারভেটরির একজন বড়ো নার্স। মনোবিজ্ঞানী কর্নেল পাকড়াশী এই অবজারভেটরির একজন বড়ো ডাক্তার। আর তাঁর একজন প্রধানা সহায়িকা হল নার্স রেখা মিত্র। মানসিক হাসপাতালকে কেন্দ্র করে তার দৈনিক কর্মযজ্ঞ গল্পে উঠে এসেছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, গল্পে 'মেন্টাল-অবজারভেটরি' এবং 'মানসিক হাসপাতাল' দুটি কথাই ব্যবহৃত হয়েছে। এই অবজারভেটরিতে ডাক্তার কর্নেল এক নতুন এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। সেটি হল মানসিক রোগীদের প্রেম ও ভালোবাসার অভিনয়ের দ্বারা তাদের সুস্থ এবং আরোগ্য করে তোলা। গল্পে তিনজন এমন রোগীর কথা পাওয়া যায়, যারা তাদের ভালোবাসার নারীদের অমোঘ স্মৃতি ভুলতে না পেরে প্রত্যেকেই মানসিক রোগী হয়ে গেছে। এদের যে কারণে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঠিক সেই ভালোবাসার সুনিপুণ অভিনয়ের দ্বারাই তাদের আরোগ্য করার পরিকল্পনা করেন ডাক্তার কর্নেল। এই কাজে একমাত্র সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে নার্স মিত্র। যার সুনিপুণ অভিনয়ের দক্ষতার জন্যই দু দু'জন রোগীর পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যে বিশেষ দিকটি এ গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে তা হল নার্স রেখা মিত্রের ভালোবাসার অভিনয় নয়, রোগীদের প্রতি তার সত্যিকারের ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগ। কেননা নার্স মিত্র সবার চোখে হয়তো ভালোবাসার নিপুণ অভিনয় করেছিল কিন্তু সে জানত শুধু অভিনয় নয়, তাদের মানসিক প্রশান্তি আনার জন্য অন্তরের ভালোবাসা দেওয়াটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নার্স মিত্রের হৃদয়ে কখনো সখনো প্রেমের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের যে আলপনা অঙ্কিত হয়েছে সে দিকগুলি বিশ্লেষণ করলে সাধারণ দুঃখ-বেদনার পাশাপাশি আমরা ভালোবাসার অরুণোদয়ের বিশেষ দিকটিই ব্যঞ্জিত হতে দেখব গল্পের শেষে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্ট এই নারী চরিত্র নিজের জীবনের দীপশিখা জ্বেলে অপর জীবনের অন্ধকার যেভাবে আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার মাধ্যমে পূর্ণ করেছে সে নারী নিশ্চয় অভিনয় করতে জানে না। তারও ভালোবাসার মতো হৃদয় আছে, আর সে হৃদয়-নীড়ে প্রেমও আছে। উপযুক্ত পাত্র পেলে সেখানে কেবল অভিনয় নয় প্রকৃত ভালোবাসা পুষ্প হয়ে ফুটে উঠে। কিন্তু নিজের জীবনের সমস্ত কিছু দিয়েও নার্স মিত্র ভালোবাসার ব্যক্তিটিকে কাছে পেল না। কেননা সে যে সবার চোখে ভালোবাসার কেবল অভিনয় করেই তিনজন মানসিক রোগীকে সুস্থ করেছে। তাদের দৃষ্টিতে সে কি সত্যি ভালোবাসতে পারে? শেষপর্যন্ত সে নিজেই হাসপাতালের তৃতীয় রোগী অমর দত্তকে আপন করে না পেয়ে একজন মানসিক রোগী হয়ে গেছে। তার ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের দিকটি আবেগঘন ভাষায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রস্ফুটিত করলেন 'দীপ জ্বেলে যাই' গল্পে। বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল এই গল্প।

গল্প শুরু হচ্ছে এক মেন্টাল অবজারভেটরি বা মানসিক হাসপাতালের বর্ণনা দিয়ে। ঝকঝকে একটা বাড়ি। পুরুষ মহিলা মিলিয়ে মোট চল্লিশেক রোগী আছে এখানে। সবার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ এক নয় তাই চিকিৎসা ব্যবস্থাও তাদের ভিন্ন। বিশেষত গল্পকার এ কাহিনিতে প্রেম-ভালোবাসার বিচ্ছেদ জনিত কারণে যে মস্তিষ্ক বিকৃতি চিকিৎসা ব্যবস্থার সেই দিকটি গল্পে তুলে ধরেছেন। এই মানসিক হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে রেখা মিত্র। সে বর্তমানে এখানে নতুন সিস্টার ইনচার্জ হয়ে এসেছে। অন্যান্য নার্সদের দৃষ্টিতে সে আগের ইনচার্জের চেয়ে ভালো এবং দরকার মতো তাকে দু-একটা কথাও বলা যায়। চ্যারিটি মিশনের মেয়ে না হলে এতদিনে সে বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়ে যেত এ কথা তারা উপলব্ধি করে। এ থেকে বোঝা যায় যে সে একজন নিঃস্বার্থ সেবিকা।

হাসপাতালের বড়কর্তা হলেন মনস্তাত্ত্বিক কর্নেল পাকড়াশি। এই পাকড়াশির দু'দুটো উদ্ভট এক্সপেরিমেন্ট সফল করেছে রেখা মিত্র। উদ্ভট এক্সপেরিমেন্টটি হল মানসিক রোগীদের ভালোবাসার অভিনয় করে সুস্থ করে তোলা। হাসপাতালে আসা সমরেশ চক্রবর্তী ও মাধব সোম মানসিক রোগের স্বীকার। যে ভালোবাসার অমোঘ স্মৃতি তাদের মস্তিষ্ক বিকারের কারণ হয়েছে সেই ভালোবাসাই পারে তাদের সুস্থ এবং নিরাময় করে তুলতে। সেজন্য ভালোবাসার অভিনয় একমাত্র পথ। এটাই কর্নেলের নতুন প্ল্যান। এই প্ল্যান অনুযায়ী সে কর্নেলের নির্দেশ মতো নিঁখুত অভিনয় করে পর পর দু'বছরের মধ্যে দু'জন মৃত্যুপথযাত্রী মস্তিষ্ক বিকৃতির মানুষকে আরোগ্য করে তুলেছে কোনো ভুলত্রুটি ছাড়াই। এরপরই এখানে তৃতীয় রোগীর আবির্ভাব ঘটল। যার একই রোগ এবং একই কারণে মস্তিষ্ক বিকৃতি। তাই কর্নেল আগ্রহের সঙ্গেই রেখা মিত্রকে ডাক পাড়েন। এই তৃতীয় রোগীকে নিয়েই গল্পের কাহিনিবৃত্ত প্রস্ফুটিত হয়েছে। রেখা মিত্রের অন্তরের অন্তঃকরণকে জানতে হলে এই তৃতীয় রোগীর এক্সপেরিমেন্টকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম দুই'জন রোগীর প্রতি ভালোবাসার অভিনয়ের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার বর্ণনা সামান্যই পাওয়া যায় গল্পে। তৃতীয় রোগীর প্রতি একদিকে সেবাযত্ন, ভালোবাসার অভিনয় এবং অন্যদিকে তার প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা সূক্ষ্মভাবে মিশে গেছে গল্পের শিকড়ে। মানসিক হাসপাতালে আসা প্রথম ও দ্বিতীয় রোগীর নাম সমরেশ চক্রবর্তী ও মাধব সোম। এদের মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ গল্পে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও তখন বোঝা যায় যখন তৃতীয় রোগী অমর দত্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়। নারীর ভালোবাসার অমোঘ স্মৃতি তাদের এমন পরিস্থিতির কারণ। তারা দুজনেই ছিল সুপুরুষ। পাগল অবস্থায় বীভৎস আচরণ করত। কিন্তু রেখা সে সবের তোয়াক্কা না করে তার রূপ-গুণের মাধুর্যে ভালোবাসা দিয়ে তাদের ভালো করে তোলে। দ্বিতীয় রোগী মাধব সোমের চিকিৎসার ভার কর্নেল প্রথম দিয়েছিলেন অপর এক নার্স বীণা সরকারকে। প্রাণপণ চেষ্টা করেছে কর্নেলের নির্দেশ কলের মতো মেনে চলতে। কিন্তু তবুও সে অসমর্থ হয় তাকে স্বাভাবিক করে তুলতে। তার

> "অভিনয়ে এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না তারও। তবু পারল না। তাকে সরিয়ে কর্ণেল রেখাকে নিয়ে এলেন আবার। এখনো ভেবে পায় না, সেই মুমূর্ষু উন্মাদকেও সে কি করে ছ'মাসের মধ্যে একটু একটু করে সম্পূর্ণ নীরোগ করে তুলল।"[৩]

বীণা যা পারেনি রেখা তা সম্ভব করে দেখিয়েছে। বীণা কৃত্রিম ভালোবাসায় ফাঁক রাখেনি ঠিকই, কিন্তু তাতে রোগীর মনের কাছাকাছি আসতে ব্যর্থ হয়েছে। অকৃত্রিম ভালোবাসায় রোগীর মনের কাছাকাছি আসা সম্ভব যেটা রেখা সাফল্যের সঙ্গে করেছে। 'ভালোবাসি প্রিয়তম, আগের সব কথা ভোলো'— এমন মিষ্টি সংলাপ এবং ভালোবাসার অভিনয় তো পুরুষের মন জয় করবেই। সাধারণের চোখে সে অভিনয় করেছে কিন্তু আসল সত্য হল রোগীর প্রতি তার অন্তরের ভালোবাসাটি। এই দু'জন রোগী সুস্থ হয়ে চলে যাওয়ার সময় রেখা মিত্রকে বলে গেছে প্রাণের জন্য চিরকাল তারা কৃতজ্ঞ থাকবে। এতে সে কোন ভ্রূক্ষেপ করেনি।

তৃতীয় রোগী এসে পড়েছে তাই নিয়ম মতো আবার ডাক পড়েছে নার্স রেখা মিত্রের। নিখুঁত অভিনয় করতে হবে তাই প্রয়োজন সুন্দর বেশবাস ও প্রসাধনের। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা এল তার। নিজের রূপ দেখে নিজের ওপরই বিস্ময় এল। আবার ডাক পড়ল তার। কর্নেল তাকে বললেন, 'এ থার্ড কনসিকিউটিভ সাকসেস উইল মেক ইউ এ ফিনিসড এ্যাকট্রেস'— যার বাংলা 'উপর্যুপরি আসা তিনটি সাফল্য তোমাকে একজন সম্পূর্ণ অভিনেত্রী করে তুলবে'। তৃতীয় রোগীটি স্বভাব চরিত্রে একটু আলাদা। রোগীর নাম অমর দত্ত। নাটক নভেল কি সব লেখে। টাইপ করা কেস হিস্ট্রি বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। সেগুলোর এক অক্ষরও পড়ল না কেননা সে জানে এসবে আর রোগী ভালো হবে না। তাকে নতুন করে রোগে ফেলতে হবে এবার— ভালোবাসার রোগ। সুলেখা নামের এক নারীর অমোঘ স্মৃতি তার মনকে বিকল করেছে, দুর্বল করেছে সেই স্মৃতি মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। যে নারীর ভালোবাসার স্মৃতি তার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ হয়েছে সেই ভালোবাসা দিয়েই তার মনে নতুন স্মৃতি তৈরি করবে রেখা মিত্র। কিছুদিনের জন্য তার মানসপটে অধিষ্ঠাত্রিণী হবে সে। প্রাথমিক চিকিৎসা এটুকুই। তারপরের কাজ ডাক্তার কর্নেলের। দরজার বাইরে থেকে কোন সাড়া না পেয়ে রেখা দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। বাহুতে হাত ঢেকে শুয়ে আছে অমর দত্ত। পায়ের শব্দে সাড়া পেয়ে নমস্কার জানাল। আগের দু'জন রোগীর কাছে যাওয়াটা নিরাপদ ছিল না প্রথম প্রথম। এই রোগীটির ব্যবহার বেশ ভালো। রকিং চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে থাকল কথা বলার জন্য। কিন্তু আধ ঘন্টা কেটে গেলেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না তার। রেখার অপেক্ষা কেবল রোগীর মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করে তার মনের মধ্যে জায়গা করে নেওয়া। এ রেখার কর্তব্য রক্ষার লড়াই। যে কিনা অপরের জীবনে আলো জ্বেলে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে নিজের জীবনের কথা না ভেবে।

রোগী অমর দত্ত সাহিত্যচর্চা করে। সে কোন একটি কবিতার লাইন মনে করতে না পেরে নার্স রেখা মিত্রকে জিজ্ঞাসা করে। নার্স উত্তর দিতে না পারলে নিজের অজান্তে সে বলেছে সুলেখা কিন্তু ফস করে বলে দিত। নিজের মুখে সুলেখা নাম শুনেই সে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে ওঠে। পাগলের মতো আচরণ করতে থাকে। সুলেখার ছবি মনে ভেসে উঠতেই রেগে গিয়ে নার্সকে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে এবং বলেছে সে আর মেয়েদের দেখতে চাই না। রেখা মিত্র কিন্তু অপমান গায়ে না মেখে তেমনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে রোগীর রূপান্তরটা উপলব্ধি করার জন্য। উত্তেজনা কমানোর জন্য একটু পরে তার ঘরে এসে ইনজেকশন দিয়েছে। চলে না গিয়ে নীরবে সেবা করেছে তার। লেখকের মতে এর পরের দু'তিন মাসের চিকিৎসা পর্বে নতুন কিছু বর্ণনার নেই। কেবল:

> "এক নারীর স্মৃতি মনে এলেই অমর দত্ত চিৎকার-চেঁচামেচি করে ওঠে তেমনি, নিঃস্ব হিমশীতল জীবনের হাহাকারে জলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়। রেখা কখনো ঘর ছেড়ে চলে যায় তার কথা মত, কখনো বা উল্টে ধমকে ওঠে সুষ্ঠু অভিনেত্রীর মত, কখনো বা প্রণয়িনীর আকুলতায় কাছে এসে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। শেষের দিকে একটু পরিবর্তন যেন উপলব্ধি করতে পারে। তর্জন-গর্জন তেমনি আছে, কিন্তু বেশিক্ষণ সে অনুপস্থিত থাকলে অসহিষ্ণুতাও বাড়ে।"[৪]

এ থেকে বোঝা যায় যে নার্স মিত্র অভিনয় নয় প্রণয়িনীর আকুলতায় রোগীর অনেকটা কাছাকাছি আসতে পেরেছে। মানসিক রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগীর মনে মধুর একটা জায়গা করে নেওয়া খুব প্রয়োজন, যেটা করতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

যখন প্রেমের আঘাতে পুরোনো স্মৃতি থেকে জন্ম নেওয়া রোগ তখন সেই প্রেমই পারে রোগীকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে তুলতে। তাই রোগী তাকে ঘর থেকে বের করে দিলেও সে আবার তার ঘরে যাওয়া আসা শুরু করে। সে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করে দিন বদলাবে এবং অমর দত্ত ভালো হবে এই বিধিলিপি। আরও মাস

দুই পরের সেই বিশেষ মুহূর্তটির অপেক্ষা শুধু। রোগী পাশের চেয়ারে বসে থাকা নার্স রেখার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে থাকে। রোগীকে নতুন প্রেমের জগতে আনতে কর্নেলের নির্দেশ মতো সে সিনেমায় অভিনীত নায়িকার মতো প্রেমের সম্পর্ক নয়, অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসার দ্বারাই উত্তরণের সোপানে পৌঁছে যেতে চেয়েছে। তার জন্য এতটা করেন কেন? অমর দত্ত এ কথা জানতে চাইলে নার্স মিত্র বলেন: "আপনি একজন এত বড় লেখক, আপনার জন্য করব না তো কার জন্য করব! কত লোক কত কিছু আশা করে আপনার কাছে।"[৫] একথা শুনে রোগী অমর দত্ত আর্তকণ্ঠে বলে এগুলো সুলেখার কথা। সুলেখা বলত তার মতো লেখক নেই, তার জন্য সব পারা যায়, সে গরীব ইত্যাদি। বোঝা যায় আর পাঁচজন নার্সদের মতো সে শুধুই তার সেবা করেনি, ভালোবাসার মোহে তাকে আকৃষ্ট করে ফেলেছে। রোগী তাই রেখার আকুলতার মধ্যে সুলেখার আকুলতার ছবিই দেখতে পেয়েছে। এরপর রেখা তাকে যত্ন করতে শয্যায় ঠেস দিয়ে বসে। শুভ্র, নিটোল দুই হাত দিয়ে মুখখানা ঘুরিয়ে দেয় নিজের দিকে। আরও কাছে ঝুঁকে গিয়ে উভয়ে কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি বিনিময় করে।

নিবিড় স্পর্শের আশ্রয়ে রোগীর পুরোনো স্মৃতিগুলো মিলিয়ে যায়। অশান্ত রোগী শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর রেখা মিত্র তাকে নিয়ে বাইরে বেড়ানো, সিনেমা দেখা, থিয়েটার দেখা প্রভৃতি করেছে নিপুণ অভিনেত্রীর মতো। তারপর অমর দত্ত সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তাকে কর্নেল পাকড়াশির কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। কর্নেল এবার রীতিমতো রোগীর প্রেমের ঘোর কাটানোর জন্য তার রোগজীর্ণ প্রতিচ্ছবিটি দেখিয়েছেন। আর পাগলামোর কিছু কিছু রেকর্ডও শুনিয়েছেন যাতে রোগীর ঘোর কেটে যায়। আসলে মানসিক রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রেমের অভিনয় করার পরবর্তী ধাপে এসবই করা হয়। যাতে রোগীরা আসল বাস্তবতাটুকু বুঝতে পারে। রেখা মিত্রের দ্বারা আগের দুই রোগীর এবং নিজের আরোগ্য লাভের সব ঘটনাই অমর দত্ত শুনল।

চলে যাওয়ার সময় অমর দত্ত নার্স রেখা মিত্রের সঙ্গে দেখা করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছে: "যাবার সময় হল, এই জন্যেই ডেকেছিলাম।...আপনাকে চিরকাল মনে থাকবে আমার।"[৬] একথা আগের রোগী সমরেশ চক্রবর্তী এবং মাধব সোমও বলেছিল। রেখা হেসে জবাব দেয়, 'সেটা কি খুব ভালো কথা হবে? তার এ কথার মধ্য দিয়ে এটাই অনুভব করা যায় যে, মনে কেউ রাখে না, আগের দু'জনও রাখেনি, অমর মিত্রও রাখবে না। কিংবা রেখা শুধু 'মনে রাখার' কথায় সন্তুষ্ট হয়নি কেননা কত মনে রাখার বিষয় মানুষ মনে রাখে না। নিছক কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য মানুষ বড়ো বড়ো বিশেষণ ব্যবহার করে বলে থাকে—আপনাকে আমার চিরকাল মনে থাকবে, আমি আপনার প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব ইত্যাদি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার কথায় বলা যায়:

> "কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে নি...
> কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না!"[৭]

রেখা মিত্র কেবল কৃতজ্ঞতাই আশা করেনি, সে একটু ভালোবাসা আশা করেছিল। নিজের রূপলাবণ্য ও ভালোবাসা দিয়ে সে তাদের আরোগ্যের জগতে ফিরিয়ে এনেছিল কিন্তু তার মনের ব্যথাটা কেউ বুঝতে পারেনি, বোঝার চেষ্টাও করেনি। মনে রাখার কথা বললেও তাদের মন থেকে কোন তিমিরে হারিয়ে গেছে রেখা মিত্র। রেখা মিত্রের মনের ভাষাকে বুঝতে হলে আমাদের গল্পের প্রথম অংশে ফিরে যেতে হবে যখন হাসপাতালে সদ্য তৃতীয় রোগী এসে পৌঁছেছে। তারপর রীতিমতো তলব পড়েছে তার। কর্নেলের তলব উপেক্ষা করা কারোর সাধ্য নেই তাই সে ঘরের দরজা বন্ধ করে কী করছে সবার সন্দেহ হয়:

> "কিন্তু রেখা মিত্র কিছুই করছে না। শিথিল আলস্যে স্রেফ শুয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে। বুকের ওপরের বইখানা দেখলেও সহকর্মিণীরা হাঁ করে ফেলত হয়ত। বিবেকানন্দের

> কর্মযোগ। তুলে নিল। উল্টে-পাল্টে দেখল একবার। হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।... চোখের সামনে ভাসছে দুটি মুখ। সমরেশ চক্রবর্তী আর মাধব সোম।"[৮]

লেখকের এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে রেখা মিত্রের অন্তরের অভিব্যক্তিকে বুঝে নিতে হবে। শিথিল আলস্যে বিছানায় বুকের উপর বই নিয়ে শুয়ে থাকা এবং কর্মযোগের মতো বইকে ছুঁড়ে ফেলা স্বাভাবিক বিষয় নয়। পরক্ষণেই সমরেশ ও মাধবের দুটি মুখ ভেসে উঠে সে যাদের ভালোবেসেছিল। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সে অভিনয় করলেও অভিনয়ের আড়ালে সে সত্যিই ভালোবেসেছিল তাদের। আবার গল্পের মাঝামাঝি অংশে অমর দত্তের শুশ্রূষা চলাকালীন পর্বে তার কিছু আচরণ লক্ষ করার মতো। তার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া, সুষ্ঠু অভিনেত্রীর মতো ধমকে ওঠা, আবার কখনো প্রণয়িনীর আকুলতায় কাছে এসে গায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়ার মধ্যে ভালোবাসার সূক্ষ্ম অনুভূতিটা উপলব্ধি করা যায়।

গল্পের প্রায় শেষ অংশে অমর দত্ত রেখা মিত্রের সঙ্গে দেখা করল এবং নমস্কার প্রদান করে চলে গেল। এখানেই কিন্তু গল্পকার গল্প শেষ করেননি। এখানে অমর দত্তর কাহিনি শেষ হয়েছে কিন্তু রেখা মিত্রের কাহিনি নয়। গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্তে গল্পকার বলেছেন:

> "অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছে বীণা সরকার, বেখা মিত্রর রোগী ভালো করবার রহস্যটুকু কি! অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছেন মনোবিজ্ঞানী কর্ণেল পাকড়াশী, কোন নির্দেশই তাঁর মেনে চলেনি রেখা মিত্র। অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছে বাকি সকলে, রেখা মিত্র রোগী ভাল করেছে, ফাঁকি দিয়ে নয়, ভালবাসার অভিনয় করে নয়, সত্যিকারের ভালবেসে। পর-পর তিন জনকেই।"[৯]

অর্থাৎ এ থেকে এটুকু স্পষ্ট যে রেখা মিত্র মনোবিজ্ঞানী কর্নেল এবং অন্যান্য নার্সদের দৃষ্টিতে ভালোবাসার অভিনয় করে আরোগ্য করে তুললেও সে কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা দিয়েই তাদের এক একজনকে কাছে টেনে নিয়েছিল। ভালোবাসার বিচ্ছেদজনিত কারণে সমরেশ, মাধব এবং অমরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, শেষপর্যন্ত প্রকৃত ভালোবাসার ছোঁয়ায় তারা একে একে আরোগ্য লাভ করল। কর্নেলের অনেক অনেক দেরিতে জানা এবং তাঁর নির্দেশ না মেনে চলার মধ্যে ইঙ্গিত করছে গল্পের সেই অংশটি, যখন তিনি বলেছিলেন 'এ থার্ড কনসিকিউটিভ...'। অমর দত্তের শুশ্রূষা করার সময় সেই কথা মনে করে হঠাৎ কর্নেলের উপর রেগে আগুন হয়ে গেছিল রেখা মিত্র। কেননা অমর দত্তের মতো রোগীরা ভালো কি মন্দ সে কথা একবারও তার মনে আসেনি। সে শুধু ভেবেছে তাদেরই একজনের মতো মেয়েদের জন্য এই মানুষটার এমন পরিণতি। তার এমন ভাবনার কারণ অতীতে সুলেখা নাম্নী এক মেয়ে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ হয়েছে। রেখা মিত্রকে রোগীদের ভালোবাসার মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হয়েছে বারবার। সে কারোর আদেশ না মেনে নিজের মতো ভালোবেসে গেছে রোগীদের। নিজের অন্তরের ভালোবাসাকে আত্মবিসর্জন করতে হয়েছে পরপর তিনবার। অপর নার্স বীণা যেটা করতে পারেনি সেটা সে করতে সক্ষম হয়েছে ফাঁকি দিয়ে নয়, অভিনয় করে নয়, সত্যিকারের ভালোবেসে। গল্পের একদম শেষে গল্পকার রেখা মিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে গল্পের ব্যঞ্জনাটি লিপিবদ্ধ হয়েছে: "হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা আর একজন বেড়েছে। রোগী নয়, রোগিণী। সে রেখা মিত্র।"[১০] এ থেকে বোঝা যায় যে, রেখা মিত্র ভালোবাসার ব্যক্তিকে কাছে না পাওয়ার জন্য সে নিজেই একজন মানসিক হাসপাতালের রোগী হয়ে গেছে। কারণ মানসিক রোগীদের সুস্থ করতে গিয়ে যে মানসিক কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়েছে তাতে এমন হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।

অবশেষে বলা যায় যে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'দীপ জ্বেলে যায়' গল্পে আমরা এমন একজন নারীর চিত্র অঙ্কিত হতে দেখলাম যার রোগীর প্রতি অগাধ স্নেহ, ভালোবাসা, দায়িত্ব ও খেয়াল রয়েছে। হাসপাতালের

নার্স রেখা মিত্র শুধু ভালোবাসার অভিনয় নয়, রোগীদের অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে আরোগ্যের আলোর জগতে উত্তরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। শেষপর্যন্ত গল্পের শেষে দেখা গেল জীবনের সবকিছু দান করে নিঃস্ব এবং রিক্ত হয়ে তাকে হাসপাতালের মানসিক রোগী হয়ে যেতে। দীপের কাজ তো আলো নেওয়া নয়, আলো দিয়ে অন্ধকার দূর করা। তাই বলা যায়, রোগীদের জীবন-অন্ধকারে ভালোবাসার দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করে যে আত্মত্যাগের জীবনবেদ সে রচনা করেছে তাতে 'দীপ জ্বেলে যাই' অভিনয়ের আড়ালে ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের সার্থক গল্প হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, সর্বাণী। কিছু কথা, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (খণ্ড ১)। মিত্র ও ঘোষ, জানুয়ারি ১৯৯৬, কলকাতা, পৃ. ৪।
২. মজুমদার, মানস। ভূমিকা, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (খণ্ড ১৩)। মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪০৬, কলকাতা, পৃ. ১।
৩. মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (খণ্ড ৮)। মিত্র ও ঘোষ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, কলকাতা, পৃ. ৩৭৮।
৪. তদেব, পৃ. ৩৮১।
৫. তদেব, পৃ. ৩৮২।
৬. তদেব, পৃ. ৩৮৩।
৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি, মে ১৯৬০, কলকাতা, পৃ. ৭৬-৭৭।
৮. মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (খণ্ড ৮)। মিত্র ও ঘোষ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, কলকাতা, পৃ. ৩৭৮।
৯. তদেব, পৃ. ৩৮৩।
১০. তদেব, পৃ. ৩৮৩।